আত্মবিশ্বাস থাকলেই হয়

আমি একজন গৃহিণী। স্বামী ও তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার। কিন্তু সরকারি চাকরিজীবী স্বামীর স্বল্প আয়ে সংসারে সুখের দেখা মেলা ভার। বর্তমান দ্রব্যমূল্যের বাজারে অভাব-অনটন যেন নিত্যসঙ্গী। এরই মধ্যে বাসাভাড়া, ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার ব্যয়ভার ও অযাচিত আবদার মিটাতে হয়। আনুষঙ্গিক খরচ তো আছেই। একার আয়ে এতসব খরচ সামলে নিতে হিমশিম খেতে হয় আমার স্বামীকে। এদিকে আমাকে গৃহিণী হয়ে সাংসারিক সব ঝামেলা পোহাতে হয়। প্রতিনিয়ত আর্থিক দৈন্যের পদধ্বনি আমার কানে বেজে ওঠে। কিন্তু ভেঙে পড়লে তো চলবে না। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম স্বামীর পাশাপাশি কিছু বাড়তি রোজগারের। কোনও উপায় না পেয়ে একদিন বিয়েতে পাওয়া অতিপ্রিয় সোনার হারটি বিক্রি করে দিলাম। হাতে পেলাম ২০ হাজার টাকা। ওই টাকা স্থানীয় দশজন মহিলার মাঝে সমানভাবে পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগ করলাম। তাদের শর্ত দেওয়া হলো পিঠাপুলির ব্যবসা করার। তারা ব্যবসা শুরু করে দেখলেন প্রতিদিনই চার থেকে পাঁচশ টাকা রোজগার হচ্ছে। অন্যদিকে পুঁজি খাটানোর জন্য প্রত্যেকে আমাকে খুশি মনেই দিচ্ছে প্রতিদিন পঞ্চাশ টাকা করে।

অর্থাৎ পুঁজি বহাল থাকার পরও প্রতিদিন আমি তাদের কাছ থেকে পাচ্ছি ৫০০ টাকা। এ টাকায় এখন আমার অভাব দূর হয়েছে। সংসারে সুখ এসেছে। পাশাপাশি যেসব মহিলা ব্যবসা করছে তারাও স্বাবলম্বী হতে পেরেছে। আমি চাই আমার মতো আরও অনেক গৃহিণী তাদের নিজ নিজ ভুবনকে এভাবে সাজিয়ে তুলুক।

মনোয়ারা খানম
শ্যামলী, ঢাকা

এই আমি বেশ আছি

বাংলাদেশে আমি জন্মেছি নারী হয়ে। এখানে যারা নারী হয়ে জন্মায় তাদের বাইরের বিশ্ব ঘরের ভেতরেই সীমাবদ্ধ। বাঙালি নারীদের পড়ালেখা শিখতে হয় সীমাবদ্ধতার ভেতর থেকে। তারা বেড়ে ওঠে অজস্র সীমাবদ্ধতার ভেতর দিয়ে। তাই আমি যখন বড় হচ্ছিলাম, লেখাপড়া শিখছিলাম তখন থেকেই আমাকে জড়িয়ে ধরে সীমাবদ্ধতার অক্টোপাস। কৈশোরে দূর থেকে মাঠে ছেলেদের ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা দেখেছি। রাতে গলির রাস্তায় নেট টানিয়ে বাল্ব ঝুলিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলা দেখেছি, কিন্তু নিজে কখনও খেলতে পারিনি। কলেজ জীবনে বান্ধবীদের সঙ্গে নদীর সৈকতে ঘুরতে গিয়েছি, কিন্তু তরুণদের মতো নদীতে উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার দেওয়া হয়নি। নব্বইয়ের দশকে যখন দেশজুড়ে স্বৈরশাসকবিরোধী আন্দোলনের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে তখন আমি খিলগাঁও কলেজে পড়ি। বাংলাদেশের প্রতিটি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের দুর্মর আন্দোলন, বিক্ষোভ মিছিল, হরতাল, অবরোধ হচ্ছিল। আমরা মেয়েরা সে বিক্ষোভে সম্পৃক্ত হতে চেয়েছিলাম। অধ্যক্ষ থমথমে মুখে জানিয়ে দিলেন– মিছিল-মিটিং মেয়েদের জন্য নয়। এসব শুনতে শুনতে একদিন রাকিবের বউ হয়ে চলে এলাম গোপীবাগ। এখানে এসে সঙ্গী হিসাবে পেয়েছি ওর মা-বাবা এবং ছোট দুটি বোনকে। সবাইকে নিয়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে সংসারটাকে নতুন আঙ্গিকে সাজালাম। রাকিবের ছোট দু'বোন ফাওজিয়া এবং তামান্নাকে নিজের বোনের মতো করে মানুষ করেছি। ওরাও আমাকে সর্বদা মেনে চলেছে। আমি কখনও ওদের বন্ধু, কখনও অভিভাবক হয়ে ছায়া দিয়েছি। দু'জনকেই বিয়ে দিয়েছি তাদের পছন্দের মানুষের সঙ্গে। তারা সবসময়ই আসা-যাওয়া করে, আমাদের খবরাখবর রাখে। আমরাও আত্মীয়তার যথাযোগ্য মূল্যায়ন করতে সচেষ্ট থাকি। যে সরলতা নিয়ে আমি ওদের পছন্দের মানুষের হাতে তুলে দিয়েছি সে সরলতা ওরা আমার সঙ্গে পুরোপুরি বজায় রেখেছে।

রাকিবের সঙ্গে আমার বিয়ের তিন বছরের মাথায় প্রথম সন্তানের জননী হয়েছি। তার চার বছর পর দ্বিতীয় সন্তানের আগমন। প্রথমটি মেয়ে। ওর বয়স এখন সাত। নাম রেখেছি রমিজা। দ্বিতীয় সন্তানটি ছেলে। ওর বয়স এখন তিন বছর। নাম রাতুল। বয়োবৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ি, দুই সন্তান এবং রাকিবকে নিয়ে সারাটা দিনই আমার ভীষণ ব্যস্ততায় কাটে। মানুষ বৃদ্ধ হয়ে গেলে ক্রমশ স্বীয় কাজ বা আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণে অনেকটাই অক্ষম হয়ে পড়েন। তখন প্রতিটি কাজেই তাদের সহযোগিতা করতে হয়। আমি আমার শ্বশুর-শাশুড়িকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সর্বদাই সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকি। প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা তৈরিতে লেগে যাই। নাস্তা তৈরি হয়ে গেলে রমিজাকে ঘুম থেকে তুলি। ওকে হাতমুখ ধুইয়ে দেই প্রথমে। তারপর রাকিব ও শ্বশুর-শাশুড়ি সবাইকে নিয়ে নাশতা করতে বসি। এরপর রমিজাকে রেডি করে স্কুলে নিয়ে যাই। রাকিব রেডি হয়ে অফিসে যায়। রমিজাকে স্কুলে রেখে টুকটাক কাঁচাবাজার নিয়ে বাসায় আসি। রাতুলকেও ঘুম থেকে তুলে নাশতা করাই। তারপর ধোয়া-মাজা শেষে দুপুরের রান্নার আয়োজন করতে থাকি। এগারোটা বাজলে আবার ছুটে যাই রমিজাকে স্কুল থেকে আনতে। বাসায় ফিরে প্রথমে রাতুল ও রমিজাকে গোসল করাই। নিজেও গোসল সারি। ওদেরকে সাজিয়ে দিয়ে রান্নারান্নার কাজে যাই। দুপুর দুটার আগেই রান্নাবান্না শেষ হয়ে যায়। শ্বশুর-শাশুড়ি ও রমিজা, রাতুলকে খাবার দেই। অতঃপর রমিজা ও রাতুলকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। বিকেলে ওদেরকে একটু খেলাধুলার সুযোগ দেই। সন্ধ্যার কিছুটা আগ মুহূর্তে রাকিব বাসায় ফিরলে দু'জন একসঙ্গে লাঞ্চ সারি। এতটা দেরি করতে প্রথম প্রথম কষ্ট হলেও এখন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, তাই সমস্যা হয় না।

সন্ধ্যার পর রমিজার টিউটর আসে। মাঝে মাঝে এ সময় রাকিব বাইরে বেরিয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে আমাকে একটু সঙ্গ দেয়। আমি এ সময় রাতের বেলার জন্য রান্নাবান্না শেষ করি। টিউটর চলে গেলে আমি রমিজার পড়ার টেবিলে গিয়ে বসি। রাত দশটা বাজলে শ্বশুর-শাশুড়ি, রমিজা, রাতুলের খাবার দেই। খাবার শেষে রমিজা-রাতুলকে ঘুম পাড়িয়ে দেই। আমি আর রাকিব পাশাপাশি বসে টিভি দেখি। আমরা দেরিতে লাঞ্চ সেরেছি বলে আমাদের ক্ষুধা হয় রাত বারোটার দিকে। তখন টিভি অফ করে একসঙ্গে ডিনার সারি। তারপর শুয়ে পড়ি।

প্রতি শুক্রবার কাজের বুয়া এসে সবার জামা-কাপড় ধুয়ে দিয়ে যায়। এভাবেই ক্রমান্বয়ে বয়ে চলেছে আমার জীবনপ্রবাহ। গৃহিণী হয়ে বেশ সুখেই আছি। বিশেষ ছুটির দিনগুলোতে বেড়াতে বের হই। ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটু আনন্দ করি। বেশ লাগে। কখনও ভাবনার ফুরসত পেলে কৈশোর ও কলেজ জীবনের স্মৃতিগুলো বুকের ভেতর হামাগুড়ি দেয়। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়– বৃষ্টির দিনে কলেজ থেকে ফেরার সময় বৃষ্টিতে ভেজার পুনরাবৃত্তি ঘটাই। কিন্তু কেন যেন তা

আর হয়ে ওঠে না। হয়তো সেই বয়স আর এখনকার বয়স এক নয় বলে।

শাহনাজ আহমেদ
গোপীবাগ, ঢাকা

জাত গেল জাত গেল বলে এ কী আজব কারখানা

'হায় চিল, সোনালী ডানার চিল/তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে/ তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে/... কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে'– জীবনানন্দ দাশের কবিতাটির এই পঙক্তিগুলো তার কণ্ঠে আর উচ্চারিত হয় না। আমি জানি, সে এখন আমাকে ঘৃণা করেও স্মরণে আনে না; এতই তুচ্ছতা নিয়ে আমার এই বেঁচে-থাকা! প্রিয় পাঠক, আমার কিছু কষ্টের কথা আপনাদের জানাতে চেয়েই নিজের প্রাপ্তি ও হারানোর কথা বলছি।

মফস্বল শহরে নানা-বাড়িতে আমার জন্ম। নানা ছিলেন বাউল স্বভাবের মানুষ। লালনের গান ভালোই গাইতে পারতেন। প্রায়শই তিনি 'জাত গেল জাত গেল বলে/ এ কী আজব কারখানা ...' গানটি গাইতেন। আমার শৈশব ও কৈশোরকালে এ গানের মূল বক্তব্য আমার কাছে তুলে ধরতে চাইতেন, কিন্তু বুঝতাম না। যখন বোঝার বয়স হলো তখন নানা মৃত্যুবরণ করেন। পরে অবশ্য ঠিকই লালনের মানবতাবোধের বিশাল বিস্তার আমাকে নাড়া দিয়েছিল। এতে সহায়তা করেছিলেন আমার বাবা, যিনি ঢাকা শহরে একটি কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি ছিলেন নাস্তিক। তবে আমার মায়ের ধর্মানুরাগে কোনও আপত্তি জানাননি। আমার তিন ভাইবোনের নামাজ-রোজার ক্ষেত্রেও তার পরোক্ষ সমর্থনই লক্ষ করেছি। যা হোক, বাবার হৃদয়ের বিশালত্ব আমাকে মুগ্ধ করত। সেই মুগ্ধতার শিকার হয়ে আজ আমি অনেকের কাছে করুণার বিষয়ে পরিণত হয়েছি।

আমি একটি বেসরকারি ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার। বয়স ৪৬। একমাত্র পুত্রসন্তান নবম শ্রেণীতে পড়ত। পড়ত বলছি এ কারণে যে, তার এখন আর স্কুলে যাওয়া হচ্ছে না। যেতে পারবে কি না জানি না।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞানে সম্মানসহ মাস্টার্স করি ১৯৮৩ সালে। খুব একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারিনি। কলেজে পড়াকালীন বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মায়ের পক্ষে সংসার চালানো দায় হয়ে পড়ে। আমাকে বেছে নিতে হয় টিউশনির পথ। নিজের পড়াশোনার খরচ চালাতাম টিউশনির পয়সাতেই। এতে আমার সময়ও ব্যয় হতো অনেক, ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টেনেটুনে বের হলাম। কোনও সরকারি চাকরি আমার ভাগ্যে জুটল না। অবশেষে ব্যাংকেই ঢুকে গেলাম।

প্রথম নিয়োগ পল্লবী শাখায়। আমার সহকর্মী শান্তনু রায় বেশ চটপটে ছিল। সে ইতিহাসের ছাত্র ছিল। চালচলন, কথা বলার ভঙ্গি, গানের গলা প্রভৃতিতে আমার নানার ছাপ লক্ষ করতাম। সেও লালনের গান গাইতে পারে খুব সুন্দরভাবে। আমি তার প্রেমেই পড়ে গেলাম। প্রায় ৪ বছর প্রেম চলল। দুজনের পরিবারের অগোচরে বিয়ে করলাম ১৯৯০ সালে। দুই পরিবারের কেউই মেনে নিল না। বিয়ে করেছিলাম মিরপুর কাজী অফিসে। শান্তনুকে মুসলমান হয়ে নাম নিতে হলো শান্তনু আহমেদ। সন্তানের মা হলাম ১৯৯৩ সালে।

বিয়ের পাঁচ মাসের মধ্যেই টের পেলাম, শান্তনু মাঝে মধ্যেই রাতের বেলা বাইরে কাটায়। কোথায় যায়, আমি জানতে চাইনি। এক সময় নিজেই বলে ফেলল, সে তার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে যায় নারায়ণগঞ্জে। আমরা দুজনেই তখন মতিঝিল কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। দুজন একসঙ্গে ব্যাংকে ঢোকার সময় অনেক কর্মকর্তা মুখ টিপে হাসত। আড়ালে-আবডালে আমাদের নিয়ে ঠাট্টা-মসকরা চলত প্রতিদিনই। আমার আরেক সহকর্মী লুৎফুল হক আমাকে জানাত সে-সব। শান্তনু একদিন আমাকে বলেই ফেলল, ভুল করেছে সে আমাকে বিয়ে করে। তখন আমার কোলে তিন মাসের সন্তান।

শান্তনুর বিরক্তি এবং আমার প্রতি উপেক্ষার কারণ তার পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। অর্থাৎ আমি মুসলিম পরিবারের মেয়ে– এটাই আমার অপরাধ। সে শান্তনু আহমেদ নাম নিয়েছিল শুধু কাজী অফিসে রেজিস্ট্রির সময়। তবে সার্টিফিকেটের নাম বদল করা হয়নি। চাকরিও করছে শান্তনু রায় হিসেবে। এক পর্যায়ে আমি তাকে বললাম, 'শান্তনু, তুমি যদি আমার কাছ থেকে মুক্তি চাও তাহলে বাদ সাধব না।' অবশেষে তাই হলো। ও এখন স্বাতী রায়ের স্বামী।

ছেলেটিকে ভর্তি করলাম মোহাম্মদপুরের একটি স্কুলে। নবম শ্রেণীতে ওঠার পর বোর্ড রেজিস্ট্রেশনের সময় প্রধান শিক্ষক ওর বাবাকে চাইলেন। আমি ওর বাসায় গিয়ে বললাম, 'শান্তনু, তুমি একটা ঘণ্টা সময় দিলে আমার খুব উপকার হয়।' শান্তনু কী ভেবে রাজি হলো। স্কুলে নিয়ে গেলাম। প্রধান শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ফেরদৌস আহমেদের বাবা?' শান্তনু উত্তর দিল, 'এ আপনি কী বলছেন, আমার নাম শান্তনু রায়। আমি মুসলমান ছেলের বাবা হতে যাব কেন?' ছেলেটি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। প্রধান শিক্ষক হা হা করে হেসে উঠলেন। আমার কান্না পেল না। কারণ লালনের সেই গানটি আমার চেতনাকে অসাড় করে তুলেছিল তখন।

ফারহানা জুঁই
লালবাগ, ঢাকা

আমি নারী আমার ভুবন

আপনি নারী। হয়তো চাকরিজীবী, কর্মক্ষেত্র সংসারের বাইরে। কিংবা সংসার আপনার কর্মক্ষেত্র। আবার আপনাদের কেউ হয়তো জড়িয়ে আছেন ব্যবসায়। চাকরি, সংসার, ব্যবসা– এ রকম যেকোনো ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা মুখ্য হলেও, প্রতিদিন কিছু-না-কিছু অভিজ্ঞতার মুখোমুখি আপনাকে হতেই হচ্ছে। সে অভিজ্ঞতা কখনো স্বস্তির কখনো অস্বস্তির; কখনো অশান্তির কখনো প্রশান্তির; কখনো আশার কখনো হতাশার; কখনো গ্লানির কখনো অর্জনের। আপনার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা জানান, অভিজ্ঞতা শেয়ার করুন অন্যের সঙ্গে। আপনার অভিজ্ঞতা অবশ্যই অন্যকে যেমন স্বস্তি দেবে, সমস্যার সমাধান করবে, আনন্দ বাড়াবে, অর্জনের তৃপ্তি উদ্দীপ্ত করবে– তেমনি আবার অন্যের অভিজ্ঞতাও হয়তো আপনার কাজে লাগবে। লিখুন, আপনার রোজকার জীবনে নানা অভিজ্ঞতার কথা। সমাজ সংসার কর্মক্ষেত্রে আপনি কেমন আছেন, কেমন করছেন তা জানান সবাইকে।

আমি নারী আমার ভুবন
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স : ৯৩৫০৯৫১ - ৩, ফ্যাক্স : ৯৩৫০৯৫৪